তারিখ ... 30 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

আমাদের কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

বুক কেঁপে উঠলো। ভয়ে নয়; অনুভূতিতে, আবেগে, উত্তেজনায়। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ; বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফরমটা হাতে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল)–এর করিডোরে দাঁড়াতেই স্বল্পালোকে চোখে পড়ল ফরমের সর্বচেয়ে উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের লেখা কথাটির উপর 'ট্রুথ শ্যাল প্রিভেইল'— সত্যের জয় হবেই। কথা নয়, এক অমর বাণী। বুক নয়, সারা দেহটাই শিহরিত হলো এক অদ্ভুত অনুভূতি আর আবেগে। এ কথাটাই আগেও শুনেছি, কিন্তু অন্যভাবে। তখন তা মনে এতো গভীর দাগ কাটেনি। গ্রামের মাইনর স্কুলের পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শীল প্রতি শনিবারে অর্ধদিবস ক্লাসশেষে চরিত্র সংশোধনী সভার আয়োজন করতেন। সেখানে নানা বিষয়ের উপর রচনা পাঠ হতো। পন্ডিতমশাই উপদেশমূলক কথা বলতেন। প্রতি শনিবার সভাশেষে তিনি নিয়মিত একটি উপদেশই উচ্চারণ করতেন— 'সদা সত্য কথা বলবে, তাহলে জীবনে বড় হতে পারবে'। তখন কি বুঝতাম জীবন কি, আর বড় হওয়াই বা কি? তখন কি জানতাম জীবন কতো বিস্তৃত প্রসারিত, পৃথিবী কতো বড়, এ জীবন পাড়ি দেয়া এক দুর্জয় সাধনা? পরে বুঝেছি, জেনেছি, ক্রমে ক্রমে। কি জেনেছি কি বুঝেছি তা বলার জন্য আজকের কলাম নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে সত্য কখনও হেরে যায় না, হারিয়ে যায় না। হয়তো ঢাকা পড়ে মেঘলা দিনের আকাশে সূর্যের মতো। কিন্তু আবার উদ্ভাসিত হয় আপন মহিমায়, বৈভবে। সেই বিয়াল্লিশ সালের জুলাইতে যে কথাটি আমার অন্তরে অনুরণন সৃষ্টি করেছিল, তা প্রায় অর্ধশতাব্দী পর আজও অনুভব করি। তাই আমাদের কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে সেই অমর বাণী দিয়েই শুরু করলাম। শুরু করলাম আরও একটি কারণে। বর্তমানে বাস্তবতার একটা নির্মম আঘাতকে অতীতের স্মৃতির প্রলেপে সহ্য করার জন্যে। সে বাস্তবতা হলো— এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রুথ নয় টেরর–এর রাজত্ব। এর দায়দায়িত্ব নিয়ে, কারণ নির্ণয়ে মতবিরোধ ও বিতর্কের অবকাশ রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতাকে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? এই টেরর শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সব অঙ্গনে, শহরে–বন্দরে, গ্রামে–গঞ্জে, জনজীবনের পদে পদে।

না, সত্যকে অস্বীকার করব না। আমাদের কালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন অবিমিশ্র শান্তিতে স্বস্তিতে ঘেরা ছিল, সম্পূর্ণভাবে নির্বিঘ্ন, নিরুপদ্রব, ভয়াশংকাহীন ছিল এমন বলব না। একটা পরাধীন দেশের জনজীবন যেমন নানা বিধিনিষেধের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়, নিপীড়ন ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে, শাসনের দেয়াল দিয়ে অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি সেদিনের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনও নানা বিধিনিষেধ দিয়ে ছিল কন্টকিত। জীবন ছিল শংকাগ্রস্ত, শাসনভীত, নিয়মকানুনের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা। ইচ্ছা হলেই একটা কিছু করা যেতো না— শাসনের রক্তচক্ষুর ভয়ে, নিজের ভবিষ্যতের ভাবনায়। একটা খারাপ রিপোর্ট বা রেকর্ড হলেই জীবনের সব সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে— এই শংকাই মনকে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখতো, ভারগ্রস্ত করে রাখতো। বিধিনিষেধের দেয়াল ভাঙার চিন্তা তো দূরের কথা, দেয়ালের উপর দিয়ে হাত বাড়াতেও ভয় পেতাম। তাই পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে মিছিল করা, শ্লোগান দেয়া, কিংবা ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল অকল্পনীয়। একটু কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস বন্ধ, ধর্মঘট, কলাভবন এবং কার্জন হলে তালা ঝুলছে— এমনটি হবার জো ছিল না। এসব ছিল 'সাবভারসিভ একটিভিটিজ' নাশকতামূলক কাজ, প্রায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়তো। এমন কি বিয়াল্লিশ সালে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 'কুইট ইন্ডিয়া', ভারত ছাড় আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বর্জনের তৎপরতা ছাত্রদের একাংশের মধ্যে দেখা গেলেও তা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। ক্লাসে ছাত্র উপস্থিতির হার হয়তো কিছুদিন হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলেনি। মনে পড়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নৌবিদ্রোহের নায়ক ক্যাপটেন রশিদ আলীর সম্মানে আয়োজিত সেই ঐতিহাসিক রশিদ আলী ডে বা রশিদ আলী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র একত্রে মিলে একটা মিছিল বের করেছিল, যে মিছিলে 'আল্লাহ আকবর' এবং 'বন্দে মাতরম'—এ দু'টি শ্লোগানই মিছিলকারী সবার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল। এ ধরনের মিছিল এবং শ্লোগান ছিল অভূতপূর্ব; অশ্রুতপূর্ব। আমার এবং আমার মতো অনেকের জীবনে— তাই ছিল সর্বপ্রথম বিক্ষোভ মিছিল। বন্দুকযুদ্ধ, বোমাবাজি? না সে আমলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ছিল অকল্পনীয়। তবে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে অঘোষিত লড়াইয়ে রত টেরোরিস্টদের কথা শুনতাম, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর নায়ক সূর্যসেনের কথা শুনতাম আর সেই সঙ্গে পরিচিত হতাম 'রিভলবর' 'বোমা' ইত্যাদি শব্দগুলোর সঙ্গে। সে আমলে ছাত্রদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়নি, মারপিটের কোন ঘটনা ঘটেনি এমন কথা বলা যাবে না। ঘটনা ঘটেছিল বিয়াল্লিশেই ছাত্রীদের এক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এর আগে থেকেই রাজনৈতিক প্রশ্নেই ছাত্রদের মধ্যে মত বিভিন্নতার বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছিল সেই ঐতিহাসিক প্রশ্ন—অখন্ড ভারত, না ভারত এবং পাকিস্তান। এই বিরোধের মধ্যেও একটা যুক্তিবাদী, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রগতিবাদী ধারা নীরবে কাজ করে গেছে ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বৃহত্তর রাজনীতির দুই পরস্পরবিরোধী ধারার প্রভাব সত্ত্বেও। এর আগে আর এক কলামে যে কথাটা বলেছিলাম তা আবার বলছি— সেদিনের সেই যুক্তিবাদী মুক্তবুদ্ধি প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনা থেকেই সাতচল্লিশ এবং পাকিস্তান পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল এ দেশে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তাধারার যার বিকাশ লাভ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথায় ফিরে আসি। আগেই বলেছি সে জীবন নিস্তরঙ্গ ছিল না। তরঙ্গায়িত হতো, কিন্তু তা বিপন্ন করে তুলতো না বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনকে, ভাসিয়ে নিয়ে যেতো না সব মূল্যবোধকে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতো না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সত্তাকে যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এই বলে an enclave, a corporate body working with a mission— মহৎ সাধনায় নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিরোধ বিতর্ক মতের বিভিন্নতার মধ্যেও হারিয়ে যেতো না একটি লক্ষ্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাকে সব কিছুর উপরে রাখা।

মর্যাদা মমতা শ্রদ্ধা সম্মান পেতেন বিশ্ব–বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্ররা তাদের চারপাশের সবার কাছ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বৃহত্তর সমাজ থেকে। প্রথমে শিক্ষকদের নিয়েই বলি, দুটো ঘটনার মাধ্যমে। আমরা ক'জন সহপাঠী কার্জন হলের পেছনে লিচুগাছ থেকে লিচু পাড়তে গিয়ে ধাওয়া খেয়েছিলাম এক ষন্ডামার্কা লোকের, যে লিচু গাছগুলো ইজারা নিয়েছিল। ভয়ে ঢুকে পড়েছিলাম অধ্যাপক সত্যেন বোসের কক্ষে। আমাদের নালিশ শুনে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক বোস। কিন্তু কি আশ্চর্য এই নিরস্ত্র বয়োবৃদ্ধ বিজ্ঞান সাধককে দেখে নিমিষের মধ্যে সেই হিংস্র চেহারার লোকটার হিংস্রতা যেন কোথায় উড়ে গেল, মাথা নত করে চলে গেল লোকটা। পরে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে সে বলেছিল 'কি যে কন, বোস সায়েবের চোখের দিকে চাইয়া কথা কমু ক্যামনে? উনারে কে না চিনে?' দ্বিতীয় ঘটনাটি ডঃ শহীদুল্লাহকে নিয়ে। চায়ের জন্য খুব পিপাসিত হয়ে চানখারপুলের এক চায়ের দোকানে, ঢাকাইয়াদের ভাষায় চায়ের 'আড়গাড়া', ঢুকে শুনি দুই 'ঢাকাইয়া'র মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহকে নিয়ে আলোচনা চলছে। অল্পবয়সী একজন বলছে, 'এ কেমুন ডাক্তার শহীদুল্লা সাব। ডিসপেন্সারী নাই, বুক দেখার যন্ত্র নাই, উত্তরে বয়স্ক আর একজন বলছে 'আমাগো ডঃ শহীদুল্লা ব্যারামের ডাক্তার না, এলেমের ডাক্তার। হেয় দিলের ব্যারাম সারায়। হের মতো ডাক্তার আমাগো মুলুকে আর ক'জন আছে? বিলাত থাইক্যা এলেম নিয়া আইছে।' গর্ব ও গৌরবে শ্রোতা বক্তা সবাই সম্মোহিত।

ছাত্ররাও স্নেহমমতা সম্ভ্রম পেতো তাদের প্রতিদিনের কাছের মানুষগুলো থেকে—হলের দারোয়ান, বয়, বেয়ারা, বাবুর্চি, রেস্টুরেন্ট মালিক আশরাফের কাছ থেকে, ফজলু মিয়ার কাছ থেকে, দুধওয়ালা করিম আর মিষ্টি বিক্রেতা অনাথ বন্ধুর কাছ থেকে। তাদের সেবা সহানুভূতি সাহায্য না পেলে কি চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন অতিক্রম করা যেতো? রেস্টুরেন্টে ঢুকলে শোনা যেতো ফজলু মিয়ার নিত্যদিনের অভিযোগ 'এত টাকা বাকি পড়লে রেস্টুরেন্ট চালাই ক্যামনে?' কিন্তু কোন ছাত্রকে নাস্তা না খাইয়ে ফিরিয়ে দিত না। আশরাফও তাই। বৃদ্ধ অনাথবন্ধু বলতো 'ভগবান আছেন ছাত্রেরা আমার টাকা না দিয়া পারবো না। এখন না পারে চাকরি পাইয়া শোধ করবো'। অনেক ছাত্রই চাকরিতে ঢুকে ফজলু মিয়ার আশরাফের অনাথবন্ধুর দুধওয়ালা করিমের পাওনা পরিশোধ করেছে। ছাত্রদের প্রতি এই ভরসা, বিশ্বাস, সম্ভ্রমবোধ শুধু এদের নয়, সেদিনের ঢাকা শহরের সাধারণ বাসিন্দারা, যাদের ঘরে হয়তো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, যাদের কথাবার্তায় থাকতো অশালীন অমার্জিত শব্দোচ্চারণ, অশিক্ষার অভিশাপের কারণে সেই 'ঢাকাইয়ারা'ও বিশ্ব–বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অন্য চোখে দেখতো। তাদের কাছে পূর্ব বাংলার সবে গড়ে ওঠা এ শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল এক গর্বের বস্তু, গৌরবের ধন; ভবিষ্যতের আশা। নিজেদের ভাগ্যহীনতার বঞ্চনার দুঃখ বুঝি ভুলতো তরুণ শিক্ষার্থীদের দেখে। যেদিন নেতৃস্থানীয় ছাত্র নাজির আহমদ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন সেদিন শোকে মুহ্যমান ঢাকাবাসীর আহাজারির চিত্রটাই বার বার স্মৃতিতে ভেসে আসছে। স্বজন হারানোর দুঃখেও বুঝি মানুষ এমন করে কাঁদে না। 'টাউন' এবং 'গাউনের' মধ্যে 'টেনশন' বা উত্তেজনার কথা অনেক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও শুনেছি। কিন্তু সেদিনের ঢাকাতে তা ছিল না। ছিল একটা অদৃশ্য বন্ধন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে যেন সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল, ভেঙে দিল সব বিশ্বাস, সব ভরসা।